আমন্ত্রিত হন প্রখ্যাত রণকুশলী সেনাপতি হান্স ভন সীক্ট্ (Hans Von Seeckt)। ১৯৩৪ সালে সীক্ট্ চীনে অবস্থিত জার্মান সামরিক মিশনের অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সীক্ট দেশে ফিরে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আলেকজান্ডার ভন ফাকেনহাউসেন (Alexander Von Fakenhausen)। এই জার্মান সামরিক মিশন চিয়াংকে পাঁচ লক্ষাধিক সৈন্য সম্বলিত এবং জার্মান সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত একটি সেনাবাহিনীর অধিকারী করে তোলে। এইভাবে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চিয়াং কাই শেক ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাম্যবাদী শক্তির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পাঁচটি সুপরিকল্পিত অভিযান ব্যর্থ হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ অভিযান চালানো হয় ১৯৩১-এর জুলাই হতে ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু এই দুটি অভিযানও ব্যর্থ হয় প্রধানত জাপানের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের জন্য। জাপানি আগ্রাসনের ফলে চীনের জনমত দাবি করে যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হলে গৃহবিবাদ থামানো দরকার। বিপরীতপক্ষে চিয়াং কাই শেক মনে করতেন যে শত্রুর সার্থক মেকাবিলার জন্য প্রথম দরকার আভ্যন্তরীণ সংহতি, সেজন্য প্রয়োজন কম্যুনিস্টদের উৎখাত করা, তারপর ঐক্যবদ্ধ চীনের পক্ষে সার্থকভাবে জাপানি আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে। ১৯৩৩ সালে জাপানিদের সাথে টাংকু যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে সই করার পর চিয়াং কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ঐ বছরের অক্টোবরে সাত লক্ষ সৈন্য নিয়ে তিনি অভিযান শুরু করলেন।

১০.১.১৪ লং মার্চ ও পার্টি নেতৃত্বে মাও সে তুং

মাও-এর কর্মজীবনে তখন এক সঙ্কটকাল উপস্থিত। তখন চীনা সাম্যবাদী দলের উপর রুশ সমর্থিত "অষ্টাবিংশতি বলশেভিক"দের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। যদিও মাও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির পদে বহাল থাকেন, তথাপি তিনি বলশেভিকদের চক্রান্তে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষমতাবিহীন সম্মানার্থক নেতায় পরিণত হন। এইরূপ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয় ফুকিয়েনের বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনা। ২৬ অক্টোবর ১৯৩৩ খিস্টাব্দে ফুকিয়েনের বিপ্লবী জনগণ সাম্যবাদীদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে জাপান বিরোধী ও চিয়াং বিরোধী একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ২০ নভেম্বর ফুচাও এ একটি জনগণের বিপ্লবী সরকারও (People's Revolutionary Government) গঠন করেন। কিন্তু তৎকালীন রুশ সমর্থিত বামপন্থী নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদীরা ফুকিয়েনের বিদ্রোহীদের কোনো সমর্থন জানাননি। পরিণামে চিয়াং ২০ জানুয়ারি ১৯৩৪ সাল নাগাদ বিদ্রোহীদের সহজেই পরাভূত করতে সক্ষম হন এবং সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনায় তৎপর হলেন। অপরপক্ষে 'অষ্টাদশ বলশেভিক দল' শত্রুপক্ষকে সুযোগদানের অপরাধে জনগণের অবিশ্বাসের পাত্র হলেন এবং মাও-এর নেতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। মাও সি.সি.পি.-র পলিটব্যুরোর প্রধান রূপে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে মাওয়ের ক্ষমতার লড়াই চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। অবশেষে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে পার্টির মিটিংয়ে আসা মাওয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ হল। জুই চিন থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে তিনি গৃহবন্দী হলেন। সাম্যবাদীদের ঘাঁটি তখন কিয়াংসি প্রদেশ। চিয়াং-এর কে.এম.টি. বাহিনী তখন পঞ্চম বা শেষ অভিযান পরিচালনায় তৎপর। কে.এম.টি. বাহিনী কিয়াংসি প্রদেশ অবরোধ করেছিল বলে প্রায় একলক্ষ সাম্যবাদী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে অবরোধ ভেঙে দুর্গম পথে অনির্বচনীয় দুঃখ কষ্ট বরণ করে এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে শুরু হল বিখ্যাত লং মার্চ। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মাও সে তুং, চু-

পদ্ধতি প্রবর্তন। এইভাবে চীনা সাম্যবাদী দলের বলশেভিক সভ্যগণ মাও অনুসৃত এবং মাও প্রদর্শিত বিপ্লবী পথ ত্যাগের আহ্বান জানালেন।

কিন্তু মাও কর্তৃক আহূত কংগ্রেসে স্বাভাবিকভাবেই মাও-এর প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং বলশেভিকরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। মাও All China Soviet Government-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন আর আগের মতোই First From Red Army-র Chief Political Commissar পদের অধিকারী রইলেন। আঠাশ বলশেভিকদের মধ্যে মাত্র তিনজনকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যপদ দেওয়া হল। মাওপন্থীরা জুই-চিনে চীনা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করলেন। এই সাধারণতন্ত্র পরিচিত হয় সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব (Democratic Dictatorship of the Proletariat and Peasantry) নামে।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাও এইভাবে জুই-চিন কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য জয়লাভে সমর্থ হলেন। তাঁর বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম ক্রমশ অধিকতর সমর্থন লাভ করতে থাকে। এই কার্যক্রম গঠিত হল পাঁচটি উপাদান নিয়ে, যথা— কৃষক শ্রেণির সমর্থন, স্বীয় দল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা, একটি স্বাধীন সামরিক শক্তি, নিরাপদ স্থানে একটি স্থলবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা। তথাপি পলিটব্যুরো আঠাশ বলশেভিকগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং মাও পলিটব্যুরোর সভ্যপদ থেকে বঞ্চিত থাকেন।

বলশেভিকদের সঙ্গে মাও-এর মতবিরোধের কতকগুলি মৌলিক কারণ ছিল, যেমন, মাও ক্ষুদ্র জমিদার, সম্পন্ন কৃষক এবং দরিদ্র কৃষক, সকলের মধ্যে সমভাবে জমি বন্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বলশেভিকদের কার্যক্রম ছিল সকল শ্রেণির জমিদার এবং সম্পন্ন কৃষকদের বঞ্চিত করে কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি পূনর্বন্টন করা। মাও-এর রণকৌশল ছিল গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতির অনুশীলন অর্থাৎ সেনাবাহিনী কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান না করে শত্রু সেনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেবে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য করে তুলবে। অপরপক্ষে বলশেভিক সভ্যদের আদর্শ ছিল সাম্যবাদী সোনাবাহিনী একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সেই নির্দিষ্ট ঘাঁটি থেকে শত্রুপক্ষের উপর অগ্রিম আক্রমণ করলে যুদ্ধে জয়লাভ অধিকতর সহজসাধ্য হবে। বলশেভিকরা মনে করত যে গেরিলা যুদ্ধ অপেক্ষা অবস্থান যুদ্ধ অধিকতর ফলপ্রদ। জামানি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মাও-এর আদর্শ ছিল জাপানি বিরোধী সকল স্তর থেকে সৈন্যদল সংগ্রহ করে এক সম্মিলিত সেনাবাহিনী গঠন করা কিন্তু বলশেভিকরা এরূপ কোনো সংযুক্ত ফ্রন্টের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের আদর্শ ছিল লাল ফৌজের একক তৎপরতায় জাপানকে যুদ্ধে প্রতিহত করা। মাও এবং বলশেভিকদের মধ্যে এরকম মৌলিক মতপার্থক্য ঘটার জন্য উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১০.১.১৩ চিয়াং কাই শেক ও কম্যুনিস্ট দলের বিরোধ

একদিকে যখন মস্কোপন্থী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রবল মাও-বিরোধিতা চলছিল অপরদিকে তখন কম্যুনিস্টদের উৎখাত করার জন্য চিয়াং কাই শেক বারবার সামরিক অভিযান চালাচ্ছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ উপদেষ্টাদের চীন থেকে অপসারিত করার পর চিয়াং তাঁর সেনাবাহিনীর উন্নতিসাধনের জন্য জার্মানির সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল ম্যাক্স বাওয়ার (Colonel Max Bauer) চীনে আমন্ত্রিত হন এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে

ক্যান্টনে যে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান হল তাও ব্যর্থ হবার পর পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসেন শিয়াং জুং ফা ও লি লি সান। মস্কোর নির্দেশ ছিল শ্রমিকরা কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চীন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেবে। তাদের কর্মসূচি হবে শহরাঞ্চলে ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত ও অভ্যুত্থানের দ্বারা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি মধ্য চীনে জঙ্গী শাসকরা গৃহযুদ্ধ শুরু করলে লি লি সান বিপ্লবের শুভ মুহূর্ত আগত মনে করে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত শুরু করে দিলেন ও লাল ফৌজ পাঠিয়ে হুনানের রাজধানী চ্যাংসা দখল করে নিলেন। কিন্তু সরকারি সৈন্যবাহিনী তাদের অচিরেই উৎখাত করল। স্তালিনের ভ্রান্ত চীনা নীতির দায় বর্তালো লি লি সানের উপর। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে মস্কোর সান-ইয়াৎ-সেনের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন শেষে আঠাশ জন ছাত্র পিকিং-এ ফিরে আসে স্তালিনের নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়ে। আঠাশ বলশেভিক নামে পরিচিত এই তরুণ দলের নেতা ওয়াং মিং এবং পো কু সি.সি.পি.-র মস্কোপন্থী গোষ্ঠীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

(ঙ) মাও সে তুঙের উত্থান : এই সময় সি.সি.পি. স্পষ্টতই দুটি পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল—চীনের কেন্দ্রীয় সংগঠন (Central Politbureau) কমিন্টার্নের প্রভাবধীন ছিল এবং অপর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন মাও সে তুং যিনি হুনান এবং কিয়াংসি গ্রামাঞ্চলে সাম্যবাদী কার্যকলাপে নিরত থাকেন। মাও সি.সি.পি.র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্তালিনের নীতির সঙ্গে মাওয়ের বাস্তবমুখী নীতির অমিল ছিল প্রচুর। সেজন্য দীর্ঘদিন তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিখ্যাত হুনান প্রতিবেদনে তিনি হুনান কৃষক আন্দোলনের নজির দেখিয়ে দাবি করেন যে চীনে বিপ্লবের অগ্রদূত হল কৃষকরা। এই ধারণা স্পষ্টত মস্কোর তাত্ত্বিক চিন্তাধারা থেকে পৃথক ছিল। চু তে ও চেন ই নামে দুজন অনুগামীর সাহায্যে মাও কিয়াংসি ও হুনান প্রদেশের পশ্চাদভূমি অঞ্চলে কৃষক সংগঠন ও সোভিয়েত গড়ে তোলেন এবং সামরিক বাহিনী গঠন করেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি কিয়াংসি প্রদেশের জুই-চিনে সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি পুনর্বন্টন করে সোভিয়েত গঠন করে এবং গেরিলা যুদ্ধেরকৌশল রপ্ত করে স্বয়ম্ভর আঞ্চলিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনোই মাওয়ের কর্মপদ্ধতি অনুমোদন করেনি। মস্কো তাঁদের সহ্য করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ শহরাঞ্চলে যখন বিপ্লবীরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তখন মাও ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণ করছিলেন।

(চ) মাওপন্থী ও মস্কোপন্থী গোষ্ঠীর বিরোধিতা—মাও পরিচালিত আন্দোলনের অগ্রগতি : সি.সি.পি. র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বা পলিটব্যুরো ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মাও-এর প্রবল বিরোধিতা করে যায়। ঐ বছরের জুলাই মাসে আঠাশ বলশেভিরে ষড়যন্ত্রে ও কমিন্টার্নের নির্দেশে মাও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত হলেন। বলশেভিকদের সঙ্গে মাওয়ের বিরোধ অবশ্য ১৯৩১ সালে শুরু হয়েছিল, যখন ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর মাও জুই চিনে (কিয়াংসি) সর্বপ্রথম সমগ্র চীনের সোভিয়েত সমূহের একটি কংগ্রেস আহ্বান করেছিলেন। মাও এই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য পলিটব্যুরোর সভ্যদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পলিটব্যুরোর প্রতিনিধি হিসাবে আঠাশ বলশেভিক দল জুই চিনে উপস্থিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁরা মাও-এর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি, ধনী কৃষকদের মধ্যে ভূমিবন্টনের মানসিক প্রবণতা, সুবিধাবাদী প্রয়োগবাদ ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করা হয়। এই সম্মেলনে বলশেভিক দল কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—ভূমি সংক্রান্ত সংস্কার সাধনে সর্বহারাদের নেতৃত্ব গ্রহণ, লাল ফৌজের সম্প্রসারণ, গেরিলা যুদ্ধরীতির স্থলে নিয়মিত যুদ্ধ

১০.১.১২ সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

(ক) নানকিং সরকারের সমস্যা : নানাকিং সরকারের সমস্যাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কে.এম.টি.-র অন্তর্দলীয় বিরোধ এবং সমরনায়কদের উৎপাত। দ্বিতীয়ত, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিরোধে দেশে চরম আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা যায়। তৃতীয়ত, চীন জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। জাপানি আক্রমণ রুখতে গিয়ে কে.এম.টি. দলের শক্তি এত বেশি ক্ষয় হয় যে কম্যুনিস্টরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে দলের শক্তিবৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

চিয়াং এর উত্তরমুখী অভিযানের ফলে উত্তরাঞ্চলের জঙ্গীশাসকরা সম্পূর্ণভাবে কখনোই অবদমিত হয়নি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে হুনান, হোনান, হুপে, হোপে, ফুকিয়েন, কোয়াংটুং এবং কোয়াংসি প্রদেশে। বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ করে এবং বিদ্রোহে সাহায্য করে এই জঙ্গী শাসকরা নানকিং সরকারকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩০ সালে চীনের মধ্যাঞ্চলের জঙ্গী শাসকরা যখন বিদ্রোহ শুরু করল তখন কে.এম.টি. দলের বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতা ওয়াং চিং ওয়াই তাদের সমর্থন করলেন। কিন্তু চিয়াংয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে ওয়াং ক্যান্টন দলে গিয়ে সেখানে একটি পৃথক সরকার স্থাপন করলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে চিয়াং আর সংঘাতের পথে গেলেন না। বরং ক্যান্টন সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় এসে তখনকার মতো উভয় সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পেলেন কিন্তু নানাকিং সরাকরের সীমিত সামর্থ্যের অনেকটা এইসব আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মেটাতে ব্যয়িত হল।

(খ) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ : ১৯৩১ সলে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে জাপান পর্যায়ক্রমে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল অংশ জয় করে সেখানে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জাপান ১৯৩৭ সালে চীন আক্রমণ করে। কিন্তু চীনের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ এবং চিয়াং-এর অনমনীয় দৃঢ়তার বলে চীন আত্মসমর্পণের বদলে জাপানের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু করে, যা শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে। জাপানি আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নানকিং সরকার প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ল।

(গ) কম্যুনিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা : জঙ্গী শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জাপানি আগ্রাসন ছাড়া কম্যুনিস্টদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল নানকিং সরকারের আরেকটি, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। নানা সমস্যায় জর্জরিত নানকিং সরকার কখনোই কম্যুনিস্ট সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারেনি প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট উদ্যম এতটুকুও নষ্ট হয়নি। তারা ব্যর্থতার গ্লানি ঝেড়ে পেলে আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে উদ্যত হয়েছিল।

(ঘ) রুশ পন্থী কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতা :১৯২৭ সালে কে.এম.টি দলের সাথে বিচ্ছেদের পর সি.সি.পি.-র বিপ্লবাত্মক কাজে বারবার ব্যর্থতা ও নেতৃত্বে বারবার পরিবর্তন এসেছিল। এই অস্থির অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন স্তালিন, যিনি চীনের বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ না করেই কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে নির্দেশ পাঠাতে থাকেন। তাঁর নির্দেশে মস্কোয় শিক্ষণপ্রাপ্ত নেতারা শহরাঞ্চলে ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার বারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিষ্ফল এইসব প্রচেষ্টার জন্য নেতৃত্বে বারংবার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯২৭ সালে প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা চেন-তু-শিউকে ব্যর্থতার অভিযোগে বরখাস্ত করে স্তালিনের পছন্দসই নেতা চু-জিউ-পাইকে পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বে স্থাপন করা হল। কিন্তু ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে

সে তুং তার প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাও তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেন "Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan" নামক প্রতিবেদনে। এই রিপোর্টে মাও চীনের বিপুল সংখ্যক কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, কিন্তু সি.সি.পি.-র একাংশ, এমন কি কমিন্টার্ন পর্যন্ত মাও-এর কথায় আস্থা জ্ঞাপন করলেন না।

তবুও, যে অনুপাতে কম্যুনিস্টরা গণবিক্ষোভকে সাফল্যের সঙ্গে জাগাতে লাগল ঠিক সেই অনুপাতে কে.এম.টি.র রক্ষণশীল সদস্যদের আশঙ্কা বাড়তে লাগল। ১৯২৬ সালের ২০ মার্চ চুংশান নামে একটি যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন কম্যুনিস্টদের প্ররোচনায় চিয়াং কাই শেককে অপহরণের চেষ্টা করেছিল। এর ফলে হয়তো তখনই কে.এম.টি.-সি.সি.পি. সহযোগিতার অবসান ঘটতো যদি না স্তালিন এইসময় হস্তক্ষেপ করতেন। সি.সি.পি.-র কাছে প্রেরিত একটি তারবার্তায় স্তানিল নির্দেশ দেন যে কম্যুনিস্ট-কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হোক এবং উহান তথা কে.এম.টি. সরকারকে একটি সাম্যবাদী একনায়কে পরিণত করা হোক।

এদিকে চিয়াঙ কাই শেক অপ্রতিহত গতিতে তাঁর অভিযান চালাতে থাকেন এবং অবিলম্বে সাংহাই দখল করে সেখানকার কম্যুনিস্ট ও শ্রমিক দলকে নির্মমভাবে দমন করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নানকিং, হ্যাংচাও, ফুচাও, ক্যান্টন প্রভৃতি যে সমস্ত স্থান চিয়াঙ দখল করতে পারলেন সেখানেই তিনি কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগলেন। কম্যুনিস্টদের চাপে উহান সরকার চিয়াঙকে সামরিক সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করল। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চিয়াঙ নানকিঙে এটি বিকল্প সরকার গড়ে তুললেন। এরপর তিনি সমস্ত কম্যুনিস্টদের কে.এম.টি.দল থেকে বিতাড়িত করলেন। অবশ্য ১৯২৮ সালের মে মাসে মাও সে তুঙ ও চুতে তাঁর অনুগামীদের একত্রিত করেছিলেন হুনান-কিয়াংসি সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চলে। তবুও কম্যুনিস্টরা কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং উহান ও নানকিঙ সরকার একত্রিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সাংহাইয়ের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এ ব্যাপারে বিশেষ সমর্থন জানালো। চিয়াঙ আবার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন। উহান সরকারকে স্বেচ্ছায় ভেঙে দিল। ফলে নানকিঙের সরকার একমাত্র জাতীয়তাবাদী সরকারে পরিণত হলো। বামপন্থীরা ঐ সরকারে একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ল। ১৯২৮ সালের ৮ জুন জাতীয়তাবাদীরা পিকিং অধিকার করল। এইভাবে ১৯২৯ সাল শুরু হবার আগেই চীনের অধিকাংশ চিয়াঙের নেতৃত্বাধীনে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এল।

এই কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কে.এম.টি. দলের হাতে। কেননা সমস্ত সরকারি অফিসার পার্টির দ্বারা নিযুক্ত হত এবং পার্টির কাছেই তারা দায়ী থাকত। দলের শীর্ষে ছিল জাতীয় কংগ্রেস, যার অধিবেশন না থাকলে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার ছিল দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভার। ঐ সভার মধ্যে ছিল একটি স্থায়ী সভা, যার সভাপতি ছিলেন কাই শেক। তাই প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিয়াঙ ও তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগী নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাতে। এ ধরণের রাজনৈতিক কাঠামোয় দুর্নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্ম অনিবার্য ছিল। উপরন্তু ঐ সময়ে চীন এক অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিল। ফলে দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে কে. এম. টি. সরকার ব্যর্থ হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ঐ সরকারকে চরম দাম দিতে হয় ১৯৪৯সালে।

গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ১৯২৬ সালের মে মাসে ক্যান্টনে যে তৃতীয় জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিলতাতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কম্যুনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল। ঐ কংগ্রেসে বলা হল যে শ্রমিকরা যে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

এদিকে কুয়োমিনতাং দলের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী,যার সমর্থক ছিলেন কুয়োমিনতাং সামরিক নেতা চিয়াং কাই শেক, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এদিকে ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে মাও সে তুং Analyais of the Classes in Chinese Society নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে শ্রমিক শ্রেণি। তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু হবে কৃষক শ্রেণি। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া ভূমিকা হবে দোদুল্যমান আর দক্ষিণপন্থী অংশ বিপ্লব বিরোধী ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারে। চেন তু শিউ যদিও মাও-এর সঙ্গে ভিন্নমত হয়েছিলেন, তবুও পরে মাও সঠিক বলে প্রমাণিত হল।

কে.এম.টি. সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র ক্যান্টনে অর্থাৎ দক্ষিণ চীনে স্থাপিত হয়েছিল। তাই জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য কে.এম.টি. সরকারের পক্ষে উত্তর চীনে অভিযান পাঠানো অনিবার্য ছিল। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে চিয়াং কাই শেক এই উত্তরাভিমুখী অভিযান শুরু করেন। এই অভিযান সফল করার জন্য কে.এম.টি. ও সি.সি.পি.র রাজনৈতিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চরেরা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে দুর্বল করে ফেলেছিল। আবার সোভিয়েত সরকারও কে.এম.টি. সরকারকে ২ মিলিয়ন রুবল মূল্যের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এই দুধরনের সহায়তার ফলে ক্যান্টন থেকে মধ্য চীন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চিয়াং অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন। তবুও সোভিয়েত সহায়তা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সন্দিহান কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েত রাশিয়ার দুরভিসন্ধি হল সাহায্য দানের মাধ্যমে কে.এম.টি. দলের ওপর কম্যুনিস্টদের আধিপত্য স্থাপন করা। এই সংশয় অচিরেই দুই দলের বিরোধ প্রকাশ্য করে তুলে বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তুললো। অবশ্য ক্রমবর্ধমান কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনও এই ভাঙনের জন্য দায়ী ছিল।

জাতীয়তাবাদী বাহিনীর উত্তরমুখী অভিযানের পর অসংখ্য শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে হুপেই ও হুনানা প্রদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি নিয়ে দুটি আলাদা ফেডারেশন গড়ে উঠল। দক্ষ শ্রমিক থেকে কারিগর ও কুলি সকলেই এই ফেডারেশনগুলির সদস্য ছিলেন। এদের ছিল নিজস্ব তহবিল, নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী, শিল্প বিরোধ মোকাবিলা করার নিজস্ব পদ্ধতি এবং সংহতিবিনাশকারী 'ব্ল্যাকলেগ'দের শাস্তিদান পদ্ধতি। কিন্তু চীনের শ্রমিক আন্দোলন ছিল একাধারে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় পুঁজিবাদী শ্রণির বিরোধী। কারণ বিদেশি মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট ছিল স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল চীনা পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে। জাতীয়তাবাদী সরকার শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। প্রথম দিকে এই নীতি অবশ্য উভয় পক্ষই সমর্থন করেছিল।

কিন্তু এই সময় থেকে কৃষক আন্দোলন একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। শ্রমিক সমিতির মতো চীনের বহু স্থানে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। কৃষকরা যেমন ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে খাজনা কমানোর জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তেমনি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের শেষদিকে কে.এম.টি. দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে "কৃষক আন্দোলন প্রশিক্ষণ সমিতি" গড়ে উঠেছিল মাও

চীনের মানুষের কাছে শ্রমিক শ্রেণি ও কম্যুনিস্টদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। সান শ্রমিকদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ফলে শ্রমিক শ্রেণি, কম্যুনিস্ট দল ও কুয়োমিনতাং দল কাছাকাছি এল। সর্বোপরি, শ্রমিকরা বুঝেছিলেন যে চীনের কৃষকদের বাদ দিয়ে একটি যথার্থ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। সমরনায়কদের অত্যাচার চীনের কৃষিজীবী মনুষ্যকে অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। তার ওপর কৃষিজ পণ্যের মূল্য মারাত্মক হারে হ্রাস পাবার ফলে কৃষকদের অবস্থা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার প্রতিবাদে উত্তর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল। এই সময় থেকেই কম্যুনিস্টরা কৃষকদের সমর্থন লাভ করার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষিণ চীনে জনৈক কম্যুনিস্ট সদস্য পৌং-পেই-এর নেতৃত্বে প্রায় দুই লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট একটি কৃষক সংগঠন গঠিত হল।

K.M.T. পুনর্গঠনের পর সান উত্তর চীনে তাঁর বহু বিলম্বিত অভিযান পাঠানোর সুযোগ পেলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সমরশাসনের উচ্ছেদ সাধন করা এবং সমর-শাসন সমর্থকদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করা। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উত্তর চীনের সমরনায়কদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ বাঁধে তার সুযোগে সান উত্তর চীনে অভিযান পাঠাতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সমরনায়ক ফেং ইউ সিয়াং এই গৃহযুদ্ধ দমন করে পিকিং অধিকার করলেন। জাতীয় সংযুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে ফেং একটি সভা আহ্বান করে সানকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু এই সভাতেই আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ সান মারা যান।

১০.১.১১ কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট ক্রমবর্ধমান বিবাদ ও বিচ্ছেদ

সানের মৃত্যুর পর তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে K.M.T.-র দুজন নেতার ওপর বর্তায়—দক্ষিণপন্থী ওয়াং-চিং য-উই এবং বামপন্থী হু হ্যান মিন। সামরিক দায়িত্ব পুরোপুরি অর্পিত হল চিয়াং-কাই-শেকের ওপর। ইতিমধ্যে 1925 সালের জানুয়ারি মাসে সাংহাইতে C.P.C.-র চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সারা দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী করে জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি সাংহাই-এর বিভিন্ন মালিকানাধীন বস্ত্র-শিল্প শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। ১৫ মে এই বরখাস্তের প্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক যৌথ আলোচনা চলাকালীন জাপানিরা কু চৌং-হুং একজন কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩০ মে প্রায় দুহাজার শ্রমিক এবং ছাত্র সাংহাইতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিদেশিদের পুলিশবাহিনী প্রচুর সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাংহাইতে ১০০০০ ছাত্র শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিলে ব্রিটিশ পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাল। ৩০ মে'র এই হত্যাকাণ্ডের ফলস্বরূপ সাংহাই ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়নস্ গঠিত হল। প্রায় দু-লক্ষ শ্রমিক এই সংগঠনের সদস্য হল। ১ জুন থেকে সাংহাইতে বিভিন্ন শিল্প-শ্রমিক, ছাত্র, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হল। সাংহাই এর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পিকিং, নানকিং, চাংসা, হ্যাংকাও প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রতিবাদ সংগঠিত হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে থাকে।

১৯২৫ সালের ২৩ জুন ক্যান্টনে একটি প্রতিবাদ মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে ৫২ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ক্যান্টন শ্রমিকদের প্ররোচনায় হংকংও প্রতিবাদে সামিল হল। ক্যান্টনের জাতীয়তাবাদী সরকার ব্রিটিশ হংকং-এর সাথে যাবতীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯২৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী এই শ্রমিক আন্দোলন কুয়োমিনতাং দলের বামপন্থী

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের দলমত নির্বিশেষে সকল চীনার অংশ গ্রহণ করা উচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সঙ্গে C.C.P.-র যোগাযোগকে তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে সোভিয়েত সহায়তায় C.C.P.-র শ্রেণি সংগ্রামের নীতি তাঁর জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনার গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে পড়বে। তাই তিনি K.M.T. দলের সঙ্গে C.C.P.-কে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, K.M.T. ও C.C.P.-র সহযোগিতার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সুবিধা। তাই তা কখনো আন্তরিকতার অভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই অনিবার্যভাবে উভয় দলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তা হয়েছিল সান-এর মৃত্যুর পরে।

দলের পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েট সাহায্যের ওপর নির্ভর করলেও দলের আদর্শ বা মতবাদের জন্য তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ওপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি লেনিনের এই তত্ত্ব মানতে পারেননি যে ধনতন্ত্র অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের দিকে নিয়ে যায়। তিনি শোষণকারী দেশের বিরুদ্ধে শোষিত দেশের সংগ্রাম সমর্থন করেছিলেন কিন্তু ঐ সংগ্রামের সঙ্গে প্রতিটি দেশের শ্রেণিসংগ্রামকে তিনি জুড়ে দিতে চাননি। K.M.T.-র আদর্শকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন "জনগণের তিন নীতি"তে। এই তিনটি নীতি বলতে বোঝাত জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা—তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নীতিগুলির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদ অর্থ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গণতন্ত্র বলতে বোঝাত জনগণের হাতে মূল শক্তি থাকার কথা, পশ্চিমী ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র নয়। জনগণের জীবিকা ছিল সমাজতন্ত্রবাদের সমার্থক। এই নীতিগুলির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে K.M.T. দলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সমর্থনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। K.M.T. দলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সমর্থনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। K.M.T. দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে লি তা চাও সহ তিনজন কম্যুনিস্ট সদস্য ছিলেন। তাছাড়া মাও সে তুঙ সহ আরও ছয়জন কম্যুনিস্টকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য হিসাবে রাখা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও সমরনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল।

আরো যে একটি কারণে K.M.T.-ও C.C.P. কাছাকাছি এসেছিল তা হল তৎকালীন চীনের শ্রমিক আন্দোলনের গতিশীলতা। C.C.P. প্রতিষ্ঠার মাত্র একবছরের মধ্যেই বেশকিছু শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হংকং অঞ্চলের প্রায় ৬০,০০০ নাবিক এবং বন্দরশ্রমিক আট সপ্তাহব্যাপী একটি ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন থেকে আরম্ভ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের রেল শ্রমিকরা এই ধর্মঘট তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এই হরতাল সফল হয়েছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মজুরি ১৫ শতাংশ থেকে ৩০শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের সংগঠন আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে পিকিং-এর নিকটবর্তী "চ্যাংঘ-সিনটিয়েন লোকোমোটিভ এ্যান্ড কার রিপেয়ার ফ্যাক্টরি"র শ্রমিকরা কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে আন্দোলন করে আট ঘন্টা কাজের দিন, সবেতন ছুটি, মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য অঞ্চলের রেল শ্রমিকেরা সংগঠিতি হতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে ইউনিয়ন গঠন করার কথা ঘোষণা করলে সমরনায়ক উপেই-ফুর সৈন্যবাহিনী ইউনিয়ন অফিস ভেঙে চুরমার করে দিল। এর প্রতিবাদে রেল শ্রমিকরা একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে সফল হলেন। ক্রুদ্ধ উপেই ফু-র সৈন্যরা নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে চারজন শ্রমিককে হত্যা করল এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত করল। এই ঘটনার প্রতিবাদে আবার শ্রমিক ধর্মঘট হল। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি ঘটনার তাৎপর্য অন্যত্র। এই ঘটনা

তু-সিউ মনে করেছিলেন যে সোভিয়েত দেশের অনুকরণে চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রের অচিরাৎ আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একদল বুদ্ধিজীবী মনে করেছিলেন চীনকে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণের শিল্পে উন্নত হতে হবে। লিয়াং চি ও লিয়াং সু মিং বিশ্বাস করতেন যে চীনের উন্নতি কাম্য চীনা জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে নয়। আবার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী লি তা-চাও গ্রামের উন্নতিসাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। চীনা ধ্রুপদী ঐতিহ্যে সমষ্টিগত জমি চাষ (জিংতিয়ান) সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার সাথে মার্কসবাদী সাহিত্যে বর্ণিত ''আদিম সাম্যবাদ' সংক্রান্ত ধারার সাদৃশ্য পেয়েছিলেন লি তা-চাও। অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের ধাঁচে চীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তবে যে দুটি মতের বৈপরীত্য চীনের পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি হল হু-শি প্রচারিত প্রয়োগবাদী ও বিবর্তনবাদী পথ যা পরবর্তীকালে চীনের জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিনতাং সমর্থন করেছিল। অপর দিকে চরমপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদের অনুপ্রেরণায় সোভিয়েত বিপ্লবের ধাঁচে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী চীনের ইতিহাসে এই দুই মতাদর্শের লড়াই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল।

১০.১.১০ সান-ইয়াৎ-সেনের কার্যকলাপের শেষ পর্যায়

ইউয়ান-শি কাই-এর মৃত্যুর পর সান-ইয়াৎ-সেন জাপান থেকে চীনে ফিরে আসেন। তিনি চীনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে চীনের কেবল সেই যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করা উচিত যা চীনকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করবে। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ক্যান্টনে একটি সরকার গঠন করেন এবং সেটিকে চীনের একমাত্র বৈধ ও স্বাধীন সরকার বলে দাবি করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসের পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না। ফলে ক্যান্টন সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবুও প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রক্ষা করতে এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী দল বা কুয়োমিনতাং দলকে শক্তিশালী করতে আত্মনিয়োগ করলেন।

কিন্তু নিজ দল কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে একতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব সানকে পীড়া দিত। তাই তিনি কুয়োমিনতাং দলকে (K.M.T.) পুনর্গঠন করতে সচেষ্ট হলেন। এজন্য সান সোভিয়েত সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১৯২৩ সালের পুনরুজ্জীবিত করতে। কুয়োমিনতাং বা K.M.T. দল সুশৃঙ্খল সভ্যদের দ্বারা গঠিত এক অত্যন্ত সুসংগঠিত দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সান-এর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের বদলে একটি সাধারণ কর্মসূচি গৃহীত হল। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের অনুকরণে দলের পুনর্গঠন করা হল। যে সকল সভ্য রুশ মডেল অনুকরণে সম্মত হল না তাদের বহিষ্কার করা হল। সভ্যের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চীনা কম্যুনিস্ট দলের (Chinese Communist Party) সদস্যদের K.M.T.-র সদস্যপদ দেওয়া হতে লাগল। C.C.P. প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া সান-ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ নবজাত C.C.P.-র প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত, কমিন্টার্ন থেকে চীনা কম্যুনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হল K.M.T-র জনপ্রিয়তার সুযোগে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য K.M.T.-র সঙ্গে সহযোগিতা করতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমিন্টার্নের এই নির্দেশ লি তা চাও এবং চেন তু শিউ মেনে নিয়েছিলেন।

আবার সান যে C.C.P.-র সদস্যদের গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ হল যে তিনি ভাবতেন তাঁর

রক্ষণশীল অংশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাথে হাত মেলানো বন্ধ করতে চেয়েছিল। এই যোগসূত্র প্রায় 20 বছর পরে মাও সে-তুঙ-কে এবং চীন বিপ্লবকে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বলে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল। মাও-সে-তুঙের 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' (New Democratic Revolution)-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি এভাবে রচিত হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ছাত্র সংগঠন, বণিক সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি ও বিভিন্ন বামপন্থী পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন চীনের বুর্জোয়া শ্রেণি কারণ তাঁরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। জাপানি পণ্য বয়কট করার কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে চীনা শিল্পপতিরা জাপানি পণ্যের বিরুদ্ধে দেশীয় বাজার দখল করতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেশজ পণ্য (Patriotic Goods) কেনার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছোটো উদ্যোক্তাদের চাঁদার টাকায় ছোটো ছোটো কারখানা গড়ে উঠে। এই সমবায় ভিত্তিক পুঁজিবাদের (Co-operative capitalism) উত্থান চৌঠা মে আন্দোলনের অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত করেছিল। এর ফলে বেশ কিছু দেশলাই ও কাগজের কারখানা গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক শ্রেণি কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তবে কৃষক শ্রেণি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কারণ চীনের গ্রামীণ সমাজ শহরভিত্তিক এই আন্দোলন থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তবে চৌঠা মের আন্দোলন থেকেই শ্রমিকরা তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিল।

১৯১৯ সালে ২৮ জুন যখন চীনের প্রতিনিধিদ্বয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বিরত হলেন তখন চৌঠা মে আন্দোলন পরিসমাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা চীনে এক সংস্কৃতিমূলক বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিল। মাতৃভাষায় প্রকাশিত কয়েকশো সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র দেশে নতুন চিন্তাধারা বিস্তার করেছিল। নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশন এবং পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির মাতৃভাষায় অনুবাদ চীনা সমাজে নতুন চিন্তার পুষ্টি সাধন করে। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Peita-পেইত) যুবক অধ্যাপকবৃন্দ ও তাঁদের ছাত্রগণ এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য ঐতিহ্য লালিত পুরাতনপন্থী ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা যেমন সমালোচিত হয়েছিল, তেমনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা এসেছিল। চীনে এক বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বজনীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই সময় জন ডিউই, বারট্রান্ড রাসেলের মতো পাশ্চাত্য মনীষীরা চীনে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, দোভাষীর সাহায্যে তাঁদের বক্তৃতা চীনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে ডিউইর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, রাসেলের মুক্তপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ, রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যের ভাবাদর্শ, ক্রপটণকিনের নৈরাজ্যবাদ, রোমা রোলাঁ ও কালজয়ী রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়ের মানবিকতা ও মানবতাবাদ মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—এ সব কিছু চীনা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিল।

এইভাবে চীনের বুদ্ধিজীবীরা নানা ধরনের দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। হু-শি ছিলেন মার্কিন প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী, তিনি ক্রমবিকাশের মাধ্যমে চীনের উন্নয়নের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। অপরপক্ষে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি তা চাও এবং বিপ্লবী সাংবাদিক চেন

বক্সার প্রটোকল অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মকুব করে দিল। এই অর্থে পিকিং-এ সিং হুয়া কলেজ (Tsing-Hua Cllege) প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতো। ১৯২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দেয় বাকি ক্ষতিপূরণও মকুব করে দিল। সেই অর্থমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হল China Foundation for the Promotion of Education and Culture। তবে, আমেরিকার থেকে ফ্রান্সের প্রভাব চীনের ছাত্রদের ওপর বেশি পড়েছিল। যুদ্ধকালীন ইউরোপের শ্রমিক ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে চীন থেকে ১,৪০,০০০ চুক্তিবদ্ধ চীনা শ্রমিক পাঠানো হয়েছিল। এই সময় ফ্রান্সে Y. M. C. A-র সভ্য জেম্‌স্ ইয়েন (James Yen)-এর মতো ছাত্রকর্মীরা গণশিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আবার, ফ্রান্সে যে চীনা ছাত্ররা অধ্যয়নরত ছিল তা শ্রম ও অধ্যয়ন আন্দোলন গড়ে তুললো। এভাবে শ্রম ও পাণ্ডিত্যের অন্তরায় দূর হল। স্বদেশ প্রেমিক ছাত্ররা দেশের দুর্নীতি ও দুর্দশা দূর করার জন্য বিপ্লবের পথ ধরতে বদ্ধপরিকর হল। চীনে সমাজতন্ত্র ধীর গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়াতে জারশাসনের উচ্ছেদ ঘটাল এবং সমাজতন্ত্রী সরকার গঠন করল। এতে পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আতঙ্কিত হল। এর ফলে যে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল, তাতে চীনের কোন দাবি গৃহীত হল না তো বটেই বরঞ্চ শান্টুং অঞ্চলে জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাকে চীনে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হল। এইভাবে চীনে চৌঠা মে আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল।

শান্টুং সংক্রান্ত ভার্সাই চুক্তির শর্ত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই ছাত্ররা জাপান বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে এটি চৌঠা মে আন্দোলন নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনে ক্ষমতাসীন ছিল জাপানি মদতপুষ্ট আনহোয়েই গোষ্ঠী, যাদের নেতা চিলেন তুয়ান-চি-জুই। এই গোষ্ঠী জাপান থেকে ২০০ মিলিয়ন ইয়েন ঋণ গ্রহণ করে চীনকে এক মারাত্মক ঋণের চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিল। কাজেই ছাত্রসমাজের ক্রোধ আছড়ে পড়ল জাপান বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে। তিনজন জাপানপন্থী মন্ত্রী আক্রান্ত হলে বিক্ষোভকারীরা দমন নীতির শিকার হলেন। এর ফলে এক বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম হল। চীনা ছাত্ররা পিকিং ছাত্র সংগঠন (Peking Students Union) গঠন করল আন্দোলন সুসংগঠিত করে তা সমগ্র চীনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। চীনা সংবাদপত্রগুলি, শিক্ষক, আইনজীবী, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানাল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাত্রবিক্ষোভ সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ল। চীনের প্রধান শহরগুলিতে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠল, ছাত্ররা জাপানি পণ্য বয়কট করার ডাক দিল। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়াল শ্রমিকরা। সাংহাই অঞ্চলের শিল্প শ্রমিক, ব্রিটিশ মালিকানাধীন কাইলান খনি শ্রমিক এবং পিকিং হ্যানকাও রেল শ্রমিকরা ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক ধর্মঘট পালন করলেন। দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন শহরে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা বিদ্রোহী ছাত্রদের সমর্থনে একসাথে অনেকগুলি বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্মঘটের সামিল হয়েছিলেন। নানা স্তরের মানুষের থেকে উঠে আসা এই প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সামাল দেবার ক্ষমতা তদানীন্তন চীন সরকারের ছিল না। তাই গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা নিঃশর্তে মুক্তি পেলেন। জাপানপন্থী তিনজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হল। সর্বোপরি, চীন সরকার ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল।

চৌঠা মে'র আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়েছিল। একদিকে তারা বৃহৎ শক্তিগুলির চীনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও অসম চুক্তি ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার নীতির বিরোধিতা করেছিল, অন্যদিকে দেশের

না বলে তাঁরা সুস্থ এবং সুসংগঠিত প্রশাসন প্রবর্তনে অপরাগ হয়েছিলেন, ফলে তাঁদের শাসনকালে প্রশাসনিক অবনতি ঘটেছিল, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সমাজ জীবন দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছিল। ইউয়ান-শি-কাইয়ের মৃত্যুর পর সমরনায়করা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি অগ্রাহ্য পরে পরস্পরের সঙ্গে বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। এর ফলে চীনে সৃষ্টি হল এক ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব—সামরিক শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংসদের অভ্যন্তরে রাজনীতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সামরিক শাসক ও রাজনীতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে একদিকে যেমন দেশের সংসদীয় প্রশাসন দুর্বল হয়, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বিঘ্নিত হয়। শক্তিশালী কর্ণধারের অভাবে কেন্দ্রবিমুখ শক্তিগুলি স্বার্থোদ্ধত কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। সমরনায়কেরা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি অগ্রাহ্য করে পরস্পরের সঙ্গে বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হল।

জনসাধারণ অশেষ দুঃখ দুর্গতির শিকার হল। লুণ্ঠন এবং অতিরিক্ত কর আদায় জনগণকে উৎপীড়িত করল। মুদ্রার মূল্যহ্রাস, ব্যবসায়ে মন্দা, জনকল্যাণমূলক রেলপথ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পূর্তকার্যে অবনতি এইসব কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হল। চিন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে যে আফিম সেবন বন্ধ হয়েছিল সামরিক শাসকরা তা পুনরুজ্জীবিত করলেন। আফিং গাছ-চাষের উপযোগী জমির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে তাঁরা সুকৌশলে কৃষকগণকে ঐসব জমিতে আফিং উৎপাদন করতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু সামরিক শাসনকালের কিছু সদর্থক প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনে পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানি কমে গেল। ফলে শহরাঞ্চলে দেশীয় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেল। ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও পশ্চিমী প্রতিযোগিতার চাপ কমে গেল, তাই চীনের অভ্যন্তরে চীন ও জাপানি ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেতে লাগল। বিদেশি ব্যবসায়ীদের সহেগ জড়িত 'কমপ্রাডোর' নামে চীনা প্রতিনিধিগণের অভ্যুদয় ঘটল। চীনা মূলধন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যেমন আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রবর্তিত হল তেমনি ঐ সব ব্যাঙ্ক ঋণদানের ব্যবস্থা চালু করল। পাশাপাশি প্রাচীন ঋণদানের ব্যবস্থাও রইল। সাঁহাই, টিয়েন্টসিন, হ্যানকাও প্রভৃতি শহরে স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে কলকারখানায় শ্রমিকদের প্রয়োজন দেখা দিল, গ্রাম থেকে শ্রমিকরা দলে দলে শহরে এসে সে প্রয়োজন মেটাতে লাগল। এভাবে একদিকে শহরভিত্তিক জীবনযাপন সমাজের রূপ বদল করল অন্যদিকে পারিবারিক জীবনযাত্রার বন্ধন শিথিল হল। পরিবারের সভ্যরা নিজেরা উপার্জনশীল হয়ে পরিবার প্রধানের আওতা মুক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটল ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠল। কারখানা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সর্বহারা শ্রমিকদের সংখ্যা দেড় মিলিয়নের কম ছিল না। দেশে বিদ্যালয় সংখ্যা ও অনিবার্যভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। গ্রামের জমিদাররা গ্রাম ত্যাগ করে শহরবাসী হলেন। গ্রামীণ সমস্যা সমাধানে আর তাঁদের সহায়তা পাওয়া গেল না। ফলে কৃষক সম্প্রদায় এখন গ্রামীণ সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে লাগল। বণিক, কমপ্রাডোর, আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র, কলকারখানার শ্রমিক-এরা সকলে প্রাচীন সমাজের রূপ বদলে দিল।

১০.১.৯ চৌঠা মে'র আন্দোলন ও তার অবদান

প্রাচীন সমাজের ভাঙ্গন রোধ করতে এগিয়ে এসেছিল নব ছাত্র সম্প্রদায়। এদের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ শিক্ষালাভ করেছিল জাপানে, বাকি অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। চীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার পুরস্কার স্বরূপ

সমাজতন্ত্র পাঠ সমিতি (Society for the Socialism)। 1920 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পিকিং-এর সমস্ত মার্কসীয় চক্র মিলিতভাবে পরিচিত হয় মার্কসীয় মতবাদ অনুশীলন সূচক পিকিং সমিতি (Peking Society for the Study of Marxist Theory)। এইভাবে একটি বিশেষ নামে বিভিন্ন মার্কসীয় চক্র বা সমিতির পরিচিতি একটি মার্কসীয় বা সাম্যবাদী দলের অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস বলে মনে করা যেতে পারে। এ. এ. মূলের (A.A. Muller) এবং এন. বর্টম্যান (N. Bortman) নামে দুজন রুশ নেতা লিকে এরূপ দল গঠনে সাহায্য করেন। কিন্তু গ্রিগোরাই ভয়টিন্স্কি (Gregorii Voitinsky) নামে রুশ কমিন্টানের এক প্রতিনিধি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে চীনে আসার আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী দল গঠন সম্পর্কে কোনো বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ঐ বছরের মার্চে ভয়টিস্কি দল গঠন সম্পর্কে লি এবং চেনের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনান্তে স্থির হয় যে এঁদের দুজনের নেতৃত্বে একটি চীনা সাম্যবাদী দল গঠিত হবে। যার একটি শাখা থাকবে সাংহাই-এ, চেনের নেতৃত্বে, অপর একটি শাখা থাকবে লি-র নেতৃত্বে পিকিং-এ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাংহাই-এ ফরাসি এলাকায় অবস্থিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে (power Middle School for Girls) আহূত একটি সভায় গোপনে চীনা সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও সে তুং সমেত বারো জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। লি এবং চেন সভায় উপস্থিত না থাকলেও চীনা সাম্যবাদী দলের যৌথ স্থাপয়িতা হিসাবে অভিনন্দিত হলেন। দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র হল সাংহাই, কিন্তু পিকিং-এ লির শাখা কার্যত স্বাধীনভাবে দলীয় কার্য পরিচালনা করতে থাকে।

শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে চেন এবং লি-র মধ্যে মত পার্থক্য ঘটেছিল। চেন শ্রমিকদের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত কারণ তাঁরা শহরের সংস্পর্শে আসার ফলে বেশি প্রগতিশীল ও সঙ্ঘবদ্ধ, অথচ কৃষক সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন ও রক্ষণশীল। কিন্তু লি-র মতে যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী, সে দেশের অর্থনীতিতে কৃষকদের স্থান অবশ্যই শীর্ষে থাকা উচিত, বিপ্লবে তাদের অবহেলা করা চলতে পারে না। লি তাঁর অনুচরবর্গকে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করতে বললেন। তিনি বলতেন চীনে কৃষকদের বন্ধন মুক্তি হচ্ছে চীনদেশের বন্ধনমুক্তি। তখনকার মতো চেন-এর মত অধিকাংশ সাম্যবাদীর সমর্থন পেলো কিন্তু লি-র সহকারী ও ভাবীকালের চীন বিপ্লবের নেতা মাও-সে-তুং লি-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন।

১০.১.৮ চীনে সমর-নায়কদের শাসনকাল ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমরনায়ক ইউয়ান শি-কাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমরকুশল নায়ক হিসাবে একনায়কতন্ত্রের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল এবং তিনি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হলেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে তিনি সামরিক অফিসারদের নিযুক্ত করেছিলেন। প্রদেশসমূহের শাসনভার তাঁরই বশংবদ সামরিক নেতাদের উপর তিনি দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি দেশে সামরিক শাসন প্রচলিত করেছিলেন। কেন্দ্রে অর্থাৎ পিকিং-এ ইউয়ানের শাসন প্রচলিত হল আর প্রদেশগুলিতে থাকল প্রাদেশিক সমরনায়কদের অধীনে। ১৯১৬ সালে ইউয়ান-শি-কাই -এর মৃত্যুর ফলে এই প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই দেশে সামরিক শাসন প্রর্বতন করেন।

সমর নেতাদের ক্ষমতার উৎস ছিল সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী পাশ্চাত্য ধাঁচে গঠিত হওয়ার জন্য দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু সমরনায়কদের পশ্চাতে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল

বিশেষের অনুবাদও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় সেন্ট সাইমনের ইউটোপিয়্যান সমাজতন্ত্র, ক্রোপটকিন এবং বাকুনিনের স্বৈরতন্ত্র এবং মার্কসের বিপ্লবী দর্শন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে, বিশেষত ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে।

আগেই বলা হয়েছে চীনে কম্যুনিস্ট প্রবাব বিস্তারে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। লেনিন মনে করতেন যে বিভিন্ন এশীয় উপনিবেশ শোষণ করার সুবিদা তাকার ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচন্ড ধ্বংসকান্ডের পরেও পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের পতন ঘটেনি। সুতরাং, ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এশীয় উপনিবেশগুলিতে ইতিমধ্যেই বিদেশি প্রভুদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা আরো শক্তিশালী করার জন্য কম্যুনিস্টদের চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পতন ত্বরান্বিত হবে লেনিনের মতে কম্যুনিস্টরা দুটি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। প্রথমত এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সম্প্রদায়, কম্যুনিস্টদের উচিত হবে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করা। প্রয়োজন হলে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাময়িক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ একই সময়ে কম্যুনিস্টদের উচিত হবে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি গড়ে তোলা, যাতে উপযুক্ত মুহূর্তে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের হাত থেকে শক্তি দখল করা যায়। ১৯২০ সালে দ্বিতীয় কমিন্টান কংগ্রেসের পর চীনসহ বিভিন্ন এশীয় দেশে লেনিনের এই দ্বিমুখী কর্মপন্থার প্রয়োগ শুরু হয়।

অপর পক্ষে, চীনা বুদ্ধিজীবীরা বলশেভিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্কসীয় ভাবধারার আলোকে চীনের সাম্প্রতিক দুর্দশার একটি যুক্তিসংগত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন। মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারায় চীনকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা পথও খুঁজে পেলেন। এই সময় থেকেই পিকিং ও সাংহাইতে মার্কস-লেনিন ভাবধারায় গঠিত কিছু পাঠচক্র গড়ে উঠল। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে চরম মতবাদ প্রকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লি-তা-চাও মুক্তকণ্ঠে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষার কথা প্রকাশ করে সিন-চাও-শি New Tide Society নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্পকালের মধ্যে স্থাপিত হয় মার্কসীয় গবেষণা কেন্দ্র। 'New Youth' পত্রিকার ১৯১৮ সালের নভেম্বর সংখ্যায় লি একটি রচনায় বলশেভিক বিপ্লবের বিজয়কীর্তন করেন, ১৯১৯ সালের একটি সংখ্যায় কেবলমাত্র মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। রসিকতা করে লি-র গ্রন্থাগারের কার্যালয়কে বলা হত 'Red Chamber', যেখানে তাঁর যুবক ও উৎসাহী অনুচরবৃন্দ মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চু-চিউ-পাই, চ্যাং-কুয়ো-তাও এবং মাও-সে-তুং, যিনি ছিলেন লি-র সহকর্মী।

তৎকালীন সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন চেন-তু-সিউ। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি ১১ জুন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ হন। উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বরে তাঁর মুক্তির পর তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন এবং সাংহাই-এ নতুন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে গভীরভাবে মার্কসবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি পশ্চিমী রাজনৈতিক আদর্শে সম্পূর্ণভাবে আস্থাহীন হন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে পশ্চিমী গণতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র যা জনসাধারণকে প্রতারণা করে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি মার্কসীয় পাঠচক্র (Marxist Study Circle) গঠন করেন এবং আগস্টে প্রতিষ্ঠা করেন সমাজতান্ত্রিক যুব সেনাদল (Socialist Youth Corps)। এই দুটি সংগঠন চীনা সাম্যবাদী দলের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

সাংহাইতে যেমন চেন-তু-সিউ, পিকিং-এ তেমনি লি তা চাও মার্কসীয় মতবাদ প্রচার ও জনপ্রিয়তা সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লি-র মার্কসীয় গবেষণা কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়

১৯১১ সালের বিপ্লবের শুরুতে দক্ষিণ চীনের প্রজাতন্ত্রীরা একটি প্রতিনিধি পরিষদ আহ্বান করেছিল, কিন্তু এ ধরণের কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি কারণ নির্বাচন কি তাই জানা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা গেল না। চীনা জনগণ সানের তিন পর্যায় বিশিষ্ট বৈপ্লবিক কার্যক্রম অগ্রাহ্য করল। ফলে ইউয়ান-শি-কাই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেলেন।

ইউয়ান-শি-কাই ছিলেন পিকিং সরকারের প্রতিনিধি। নানকিং এ অস্থায়ী সরকার গঠনের পর সান একটি তারবার্তায় ইউয়ানকে জানালেন যে তিনি যদি প্রজাতন্ত্র সমর্থন করেন তাহলে সান তাঁকেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে বরণ করবেন। ইউয়ান মাঞ্চু রাজপরিবারের সঙ্গে এই মর্মে এক বোঝাপড়া করেন যে নতুন সরকারের কাছ থেকে রাজপরিবারের সদস্যরা সুব্যবহার পাবেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী শিশু সম্রাট পু-ঈর তরফে সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষণা করা হল। ১৪ ফেব্রুয়ারী সান পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ইস্তফা দিলেন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইউয়ান চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

সান তাঁর পদত্যাগ পত্রে তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমত, অস্থায়ী সরকার নানকিং-এ গঠিত হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা নানকিং-এ এসে কার্যভার গ্রহণ করলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। তৃতীয়ত, নতুন রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী সরকারের সংবিধান মেনে চলবেন। তিনি ইউয়ানকে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির ঘাঁটি পিকিং থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সান ভেবেছিলেন যদি ইউয়ানকে নানকিং-এ বিপ্লবী শক্তির হেফাজতে রাখা হয় এবং একটি সংবিদানের বেড়াজালে বন্দী করা হয় তবে ইউয়ান কখনো একনায়কে পরিণত হতে পারবেন না। কিন্তু ইউয়ান ছিলেন আরো ধুরন্ধর। তিনি এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করেন, যাতে পিকিং-এ সরকারি সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করল বেং ইউয়ান নানকিং-এ সরকার গড়তে অস্বীকার করলেন এই অজুহাতে যে তাহলে পিকিং-এ প্রজাতন্ত্র টিকিয়ে রাখা যাবে না। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই মার্চ ইউয়ান পিকিং-এ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। ঐ দিনই যে নতুন সংবিদান ঘোষিত হল তাতে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু হল। চীনা নাগরিকরা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুইভাবে বিভক্ত হল এবং অধিকাংশ চীনা নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের স্বপ্ন মরীচিকাতে মিলিয়ে যেতে দেখেও সান রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। ৫ এপিল সিনেট অস্থায়ী সরকার পিকিং-এ নিয়ে এল। চীনে সমর নায়কতন্ত্র কায়েম হল। কিন্তু রাত্রির পরেই যেমন ঊষার আগমন ঘটে, তেমনি জঙ্গী শাসনের পরেও নতুনের অভ্যুদয় ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কারণ, চল্লিশ বছর ব্যাপী জঙ্গী সাসনকালে যে অর্থহীন যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছিল তাতে চীনের অন্তর্নিহিত সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল এবং দেশের অধিকাংশ লোক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় চীনে নতুন ভাবাদর্শ প্রবেশ করার ও তা স্থায়ী হবার এক উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহ্যকে আঁকড়ে না থেকে চীনা জনগণ নতুন ও বিদেশি ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছিল।

১০.১.৭ চীনে কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা

১৯০৫ সাল নাগাদ চীনে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় মিন-পাও (The Peoples Tribune) পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কার্ল মার্কসের জীবনী প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরতান্ত্রিক পত্রিকা তিয়েন-ই-পাও (Journal of Natural Justice) ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের Introduction to the Communist Manifesto-র অনুবাদ প্রকাশিত করে। এঙ্গেলসের Origin of the Family থেকে অংশ

একটি অস্তায়ী সংবিধান রচিত হবে। এই পর্যায়কে বলা হবে অবিভাবকত্বের কাল (Period of Tutelage)। এরপর আসবে তৃতীয় পর্যায় যখন সামরিক শাসন বিলুপ্ত হবে এবং দেশে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে।

১০.১.৬ ১৯১১ সালের বিদ্রোহ : প্রসার, ব্যর্থতা ও তাৎপর্য

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে চিং সরকার ঘোষণা করে যে দেশের অভ্যন্তরে যাবতীয় রেলপথকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। সরকার রেলের বিদেশি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ারগুলি প্রকৃত মূল্যের ৪৫ বা ৪৬ শতাংশ মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। মূল্যের বাকি অংশের বিনিময়ে বিদেশি কর্তৃপক্ষকে ঋণপত্র লিখে দেবে। এভাবে চিং সরকার দেশকে বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করছিল। স্বভাবতই জনসাধারণ এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু চিং সরকার এতে কর্ণপাত করেনি। এই ঘোষণা সি-চুয়ান, হুনান, হুপেই, কুয়াংটং প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহী করে তুলল। সি-চুয়ান অঞ্চলে সরকারি সেনাবাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্রোহী কৃষকরা সি-চুয়ানের প্রাদেশিক রাজধানী চেং তু অবরোধ করল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর উ-চাং অঞ্চলে এক জঙ্গী গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। বছরের দশম মাসের দশম দিনে এই অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছিল বলে এবং দুই দশের অভ্যুত্থান (Double Ten Rising) বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমিক ও ছাত্ররা এই উত্থানের সামিল হয়েছিল। জঙ্গী আন্দোলনের মুখে পড়ে উ-চাং-এর চিং শাসনকর্তা এলাকা ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। এই সুযোগে বিপ্লবীরা দুটি প্রতিবেশী শহর হ্যানকো এবং হ্যান-ইয়াং দখল করে নিল। উ-চাং বিপ্লবীদের সমর্থনে তুং মেং হুইর সদস্যরা সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলল। একের পর এক প্রদেশ মাঞ্চু শাসনের কবল থেকে মুক্ত হল। সমগ্র মধ্যচীন বিপ্লবীদের কবলিত হল। মাঞ্চু শাসনের দুর্বলতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুক্ত প্রদেশগুলির বিপ্লবী প্রতিনিধিরা নানকিং-এ মিলিত হয়ে একটি প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। ১৯২২ সালের ১জানুয়ারি বিপ্লবীরা নানকিং-এ একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করল। ড: সান-ইয়াৎ সেন এই অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সাফল্যের সাথে চীনের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করেছিল। এমন কি, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশেও চিং রাজতন্ত্রের ফিরে আসার রাস্তা বিপ্লবীরা খোলা রাখেননি। কিন্তু ১৯১১ সালের এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ সান ইয়াৎ সেনের তিনটি নীতিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের প্রাধান্য তখনও অটুট ছিল। গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা হয়নি। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে চীনের সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল অধরা। বিপ্লবীদের মতাদর্শগত অনৈক্যের সুযোগে অনেক সমাজবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের হাত থেকে ক্ষমতা অপসৃত হল এবং ইউয়ান-শি-কাই-এর মতো সমর নায়কদের (Warlords) হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল।

আসলে কাগজে কলমে নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সফল হবার মতো অনেক উপাদান ছিল। যেমন, সংবিঠান, সংসদীয় কার্যপদ্ধতি, আইনের ধারা ইত্যাদি। কিন্তু সংবিধান কাগজ বন্দী রয়ে গেল, তাই সংসদীয় কার্যপদ্ধতি বা আইন কোনোটিই বাস্তবায়িত হল না। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই যে প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রজাসমূহের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্রী নাগরিকত্বের কোনো ধারণা ছিল না।

সালে চীনে ফিরে এসে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। চীনের সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি তাঁকে চিন্তাকুল করে তুলেছিল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সান-ইয়াৎসেন চীনের পুনরুভ্যদয় সমিতি (Revive China Society) বা জিং-জং-খুই নামে একটি গুপ্ত সমিতি সংগঠিত করেন যার কেন্দ্রীয় কার্যালয় তৈরি হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে ক্যান্টনে এবং তারপরে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হুইজাউতে সান-এর নেতৃত্বাধীন জিং-জং-খুই মাঞ্চুর রাজতন্ত্র বিরোধী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করল, কিন্তু উভয় স্থানেই তা ব্যর্থ হল। অবিচলিত সান মাঞ্চু রাজতন্ত্র বিরোধী জেহাদ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই চীনে আরো কতকগুলি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'চীনের পুনরুত্থান সমিতি" (Society for Restoration of China)। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সান-ইয়াং-সেন টোকিওতে বসে সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। মাঞ্চু বিরোধী সমস্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সান-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হলেন।

১০.১.৫ সান এর নেতৃত্বে ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব

মাঞ্চু বিরোধী সমস্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সান-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি তুং মেং হুই United League নামে এটি নতুন ও ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠনটি ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিল। Jean Chesneaux (জাঁ শ্যেনো) তাঁর China from the Opium War to the 1911 Revolution গ্রন্থে বলেছেন যে তুং মেং হুই একটি ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক সংগ্রাম সার্থকভাবে পরিচালনা করেছিল এবং এর ফলে একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল। তুং মেং হুই-র প্রাণপুরুষ সান তিনটি নীতি প্রচার করেছিলেন—(১) জাতীয়তাবাদ (২) গণতন্ত্র (৩) সমাজতন্ত্র বা জনসাধারণের জীবিকা। জাতীয়তাবাদ বলতে সান বুঝতেন মাঞ্চু শাসনের বিরোধিতা। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তেমনি সমাজতন্ত্র বলতে তিনি বুঝতেন যদি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে একদিকে চীনের কৃষকরা সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবে, অন্যদিকে চীনে পশ্চিমী পুঁজিবাদের উত্থান রোধ করা সম্ভব হবে। এখানেও সান কিন্তু সমগ্র সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। গণতন্ত্র বলতে তিনি বুঝেছিলেন একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান যেখানে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। এ ছাড়া শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ হবে পৃথক। ফরাসি বিপ্লবের অনুকরণে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের কথা ঘোষণা করে তুং মেং হুই তার ইস্তাহারে বলেছিল যে এখন প্রয়োজন জনগণের বিপ্লবের। Immanuel Hsu (ঈম্যানুয়েল সু) তাঁর Rise of Modern China গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে সান একটির মধ্য দিয়ে তিনটি বিপ্লব সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে মাঞ্চু রাজবংশ ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র গঠন এবং সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ভূমি বন্টনের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠা করে চীনে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের উত্থানের পথ রোধ করা। সান বিপ্লবের একটি বিস্তৃত কর্মসূচি রচনা করেছিলেন। তিনভাগে বিভক্ত এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়টি ছিল তিন বৎসর ব্যাপী। এই সময়ে দেশ সামরিক শাসনাধীনে থাকবে কিন্তু প্রতি জেলায় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সামরিক প্রশাসকরা দেশ থেকে অনিষ্টকর প্রথাগুলি যেমন, দাসত্ব, পদবন্ধন, অহিফেন-ধূমপান ইত্যাদি দূর করার জন্য সচেষ্ট হবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় বছরের জন্য কেন্দ্র সামরিক শাসনে থাকবে বটে কিন্তু সামরিক প্রশাসক ও জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে

ছিল না। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা আফিং যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হয়েছিল তার শর্তানুযায়ী বিদেশি শক্তিবর্গের কাছে উন্মুক্ত বন্দরের সংখ্যা ছিল পাঁচে। সেই সংখ্যা ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশে। বিদেশি শক্তিবর্গ চীনা নাগরিকদের ওপর অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করেছিল। চীনের সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাড়ল অর্থনৈতিক শোষণ। চীনের শুল্ক দপ্তর, ডাকঘর, রাজস্ব বিভাগ সর্বত্র বিদেশিরা নিযুক্ত হতে থাকে। শিক্ষা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

১০.১.২ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা

এইভাবে চীনে আধুনিকতার সূচনা হল, যা পরিণতি পেল ১৮৯৮ সালের শতদিবসের সংস্কার আন্দোলন এবং ১৯০০ সালের বক্সার আন্দোলনের মাধ্যমে। এইসব ঘটনা চিনের ইতিহাসে আশু এক রাজনৈতিক বিবর্তনের পথ প্রস্তুত করেছিল। পরিণামে ১৯১১ সালে চিং শাসনের অবসান ঘটল এবং দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এর পর থেকে চীনের ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হল বিচিত্র গতিতে। কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ দুর্নীতিই চীনের জাতীয় মেরুদণ্ড ভঙ্গ করতে পারেনি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আফিং সেবনের মতো মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিগুলি মাওয়ের আন্দোলনের জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। সাম্যবাদী দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চীন শেষ অবধি তার জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিক্রম করে উপনীত হয় কল্যাণকর এবং সম্ভাবনা সমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল সুপ্রভাতে। চৈনিক রূপান্তর ঘটল।

১০.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজমের সূচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে নানা কারণে জাতীয়তাবাদ প্রবল হতে থাকে। একদিকে ছিল বিদেশিদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি, বিদেশি শোষণ এবং জঙ্গী নায়কদের দুঃশাসন, এর ফলে দেশে দারিদ্র, অত্যাচার ও অনৈক্য বেড়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে পশ্চিম হতে আগত নতুন নতুন ভাবধারা বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল চীনকে বিপদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে। চীনের অনৈক্য, দ্রারিদ্র্য ও অপশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের জন্য বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতারা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমী দেশগুলির কাছে সাহায্য পাওয়ার আশা করেন। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি ও ওয়াশিংটন সম্মেলন উভয় স্থানেই চীন অত্যন্ত হতাশ হয়। কারণ, প্রথমটিতে চীনকে বঞ্চিত করে শানটুং প্রদেশটি জাপানকে দেওয়া হল। আর দ্বিতীয়টিতে চীনকে বিদেশি শোষণ ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা করা হল না। কিন্তু ঐ দুটি কারণই ছিল চীনের দূর্দশার মূল। ফলে চীনের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে বিদেশি শক্তিগুলি চীনকে কোনো রকম কার্যকরী সাহায্য করবে না। তাই, এই পরিস্থিতিতে চীনে যেমন জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের পুনর্গঠন ঘটল, তেমন কম্যুনিস্ট দলের আবির্ভাব সম্ভব হল। তবে চীন যে পুরোপুরি বিদেশি সহায়তা বর্জন করতে পেরেছিল তা নয়। এই সময়েই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। কুয়োমিনটাং দলের পুনর্গঠন বা কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা—দুটি ঘটনাতেই রাশিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব কাজ করেছিল।

১০.১.৪ ড. সান ইয়াৎসেন-এর উত্থান

1866 খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টনের একটি কৃষক পরিবারে সান ইয়াৎসেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮০ দশকে তিনি হংকং-এ যান এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৫

- পাশ্চাত্য সংযোগ চীনের জনজীবনে কেমনভাবে আলোড়ন তুলেছিল। চীন কিভাবে পাশ্চাত্য প্রবাব আত্মস্থ করেছিল একাধিক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে।
- চীনে কিভাবে সাম্যবাদী ধারণার সূত্রপাত ঘটেছিল। রাশিয়া প্রথমদিকে চীনা বুদ্ধিজীবীদের পথ প্রদর্শক ও উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।
- মাও সে তুং-এর অভিনব ও একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা কিভাবে রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে চীনের নিজস্ব আন্দোলনধারা গড়ে তুলল।
- চীনে একই সঙ্গে জাপানি আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে জনসমর্থিত একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। চীনের এই অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১০.১ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং ধর্মপ্রচার চীনের চিরাগত জীবনচর্যার ভরকেন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। চীনাদের ওপর বিদেশিদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার, শুল্ক দপ্তর, ডাকঘর, রাজস্ব বিভাগ সর্বত্র বিদেশিদের নিযুক্ত এবং শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব চীনবাসীকে নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছিল। এর ওপর জাপান চীন ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য চীন আক্রমণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীন পশ্চিমী শক্তিদের ব্যবহারে আরো অসম্মানিত হল। জাপানের ২১ দফা দাবি, প্যারিস শান্তি সম্মেলনের চীনা-বিরোধী সিদ্ধান্ত, ভার্সাই সন্ধির শানটুং সংক্রান্ত প্রতিকূল নির্দেশ—এসবের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্রকূল শুরু করে চৌঠা মের আন্দোলন। এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে জঙ্গী সমর নায়করা উত্তর ও মধ্য চীনে স্বশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে দেশের সংহতি বিনষ্ট করে। এদিকে ডঃ সন ইয়াৎসেন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনতাং দল আন্দোলন করতে শুরু করলো দক্ষিণ চীনে। তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক কুয়োমিনতাং দলের পরিচালক হলেন। ইতিমধ্যে চীনে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি নামে। চিয়াং সাম্যবাদীদের ধ্বংস করার জন্য জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে মদত দিতে লাগলেন। কিন্তু মাও সে তুং-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব চীনকে বহিঃশত্রু জাপানকে ও আভ্যন্তরীণ শত্রু জাতীয়তাবাদীদের পরাস্ত করতে সক্ষম করে। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। এই এককটিতে চীনের ইতিহাসের এই বিচিত্র গতির একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। চীন কিভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির মোকাবিলা করেছিল, এই এককে তা তুলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবকে চীন আত্মস্থ করেছিল তার নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী। এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল সাম্যবাদী দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। চীন শেষ অবধি তার জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিল কল্যাণকর এবং সম্ভাবনা সমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল সুপ্রভাতে।

১০.১.১ উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ

উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গ চীনের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং চীনের অভ্যন্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দাবি নিয়ে চীনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল। এই সমস্ত দাবি চীনের জাতীয় জীবনে এক বিপর্যয় নিয়ে এল, যা রোধ করার মতো শক্তি তদানীন্তন চিন সরকারের

একক ১০ ❑ চীনের বিপ্লব

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ প্রস্তাবনা

১০.১.১ উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ

১০.১.২ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা

১০.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজমের সূচনা

১০.১.৪ ড. সান ইয়াৎ সেনের উত্থান

১০.১.৫ সান এর নেতৃত্বে ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব

১০.১.৬ ১৯১১ সালের বিদ্রোহ : প্রসার, ব্যর্থতা ও তাৎপর্য

১০.১.৭ চীনে কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা

১০.১.৮ চীনে সমর নায়কদের শাসনকাল ও তার প্রতিক্রিয়া

১০.১.৯ চৌঠা মে'র আন্দোলন ও তার অবদান

১০.১.১০ সান ইয়াৎ সেনের কার্যকলাপের শেষ পর্যায়

১০.১.১১ কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট ক্রমবর্ধমান বিবাদ ও বিচ্ছেদ

১০.১.১২ সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

১০.১.১৩ চিয়াং কাইশেক ও কম্যুনিস্ট দলের বিরোধ

১০.১.১৪ লং মার্চ ও পার্টি নেতৃত্বে মাও সে তুং

১০.১.১৫ জাপান বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট

১০.১.১৬ সাম্যবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৯৩৭-৪৫) : ইয়েনান কাল

১০.১.১৭ কে. এম. টি. সি. সি. পি. সংগ্রামের শেষ পর্যায়

১০.১.১৮ তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয়

১০.১.১৯ মাওয়ের সাফল্যের কারণ

১০.১.২০ উপসংহার

১০.২ সারাংশ

১০.৩ অনুশীলনী

১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে চিরতরে বিদায় দিতে পেরেছিল। এই অতুলনীয় কৃতিত্বের কথাই এই এককটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

২৩. আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলনের সাফল্য কি সম্ভবপর বলে আপনি মনে করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৭ লিখুন।

২৪. টীকা লিখুন : (১) আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জন (১) নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৫ এবং ১.২.৩৭ লিখুন।

২৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা ও রাশিয়ার উত্থানের পটভূমি লিখুন।

২৬. আমেরিকা ও রাশিয়ার শক্তির একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উ: ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ ১.২.৩৮, ১.২.৩৯ এবং ১.২.৪০ দেখুন।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. Europe and the Wider World–ed. by Bernard Waites.

২. The World Since 1919–Langsamand Mitchell.

৩. International Relations Since 1919–A.C. Roy.

৪. A History of War and Peace 1939-1965–Wilfried Knapp.

৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস—প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস—জয়ন্তকুমার রায় ও প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী।

৭. Keplar : Twentieth Century World.

৮. World Politics Since 1945–Peter Kelvokoressi.

৯. ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কিভাবে হয়েছিল? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর অভিঘাত কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৫ লিখুন।

১০. মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি ধারা রচনা করুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৬ লিখুন।

১১. ব্রহ্মদেশ কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৭ লিখুন।

১২. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কি ভূমিকা আপনি লক্ষ্য করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৮ লিখুন।

১৩. ইন্দোচীনে আমেরিকা ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব কিভাবে আপনার চোখে পড়ে?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৯ লিখুন।

১৪. টীকা লিখুন : (১) কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন (২) লাওসের স্বাধীনতা আন্দোলন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২০ এবং ১.২.২১ লিখুন।

১৫. মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কি কোনোভাবে তার আন্তর্জাতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল বলে আপনি মনে করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২২ এবং ১.২.২৩ লিখুন।

১৬. মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৪ লিখুন।

১৭. আপনি কি মনে করেন প্যালেস্টাইন সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকট? আমেরিকার হস্তক্ষেপ কি সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৫ এবং ১.২.২৬ লিখুন।

১৮. সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব কি ভূমিকা পালন করেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৬ লিখুন।

১৯. টীকা লেখুন : (১) পারস্যের স্বাধীনতা লাভ (১) মিশরে ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৭ এবং ১.২.২৮ লিখুন।

২০. মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসানের কি ফলাফল হয়েছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩০ লিখুন।

২১. আফ্রিকা ও এশিয়াতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩১ লিখুন।

২২. আফ্রিকার জাগরণের আন্তর্জাতিক ফলাফল কী হয়েছিল? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৩ এবং ১.২.৩৪ লিখুন।

৯.৩ সারাংশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দুটি ইউরোপ বহির্ভূত অতিরাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং এশিয়া-আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার অবসান ও নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রূপান্তর ঘটায়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল ইউরোপের বাইরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও চীনে কম্যুনিস্ট শক্তির ক্ষমতালাভ সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে মতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও সংঘর্ষ দেখা দেয়। মধ্যপ্রাচ্য হল আরেকটি সংঘর্ষের এলাকা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদের জীবন মরণ সংঘর্ষ চলে। আফ্রিকাতে ঔপনিবেশকতার অবসানের দাবিতে ছোটো বড়ো নানা ধরণের সংঘর্ষ শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

৯.৪ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২-২.৯ দেখে উত্তর লিখুন।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার একটি খসড়া লিখুন।

উ: ১.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভাবাদর্শের সংঘাত কিভাবে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন আনল?

উ: ১.২.৪ এবং ১.২.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কি প্রভাব পড়েছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৬ লিখুন।

৫. আফ্রিকা ও এশিয়াতে উপনিবেশের অবসান কী তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বহন করে?

উ: ১.২.১০ এবং ১.২.১১ অনুচ্ছেদ লিখুন।

৬. চীনের ইতিহাস কিভাবে ঔপনিবেশিকতার অবসানকে প্রতিফলিত করেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১২ লিখুন।

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের পরিণতি কি হল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৩ লিখুন।

৮. নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়কালে কি কি সমস্যা আপনি লক্ষ্য করেন?

উ: ১.২.১৪ অনুচ্ছেদ দেখুন।

শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেখানে রাশিয়ার কেন্দ্রাভিমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল। এছাড়া তার উন্নয়নের হার আমেরিকার মতো উর্দ্ধমুখি ছিল না, তার শক্তি, প্রতিভা, বিশ্বে তার ভূমিকা, এমনকি সোভিয়েত ভীতি সবই তখন যতটা অতিকায় মনে হয়েছিল বাস্তবে তা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা ধরা পড়েনি। বরঞ্চ জর্জ কেন্নান (Gcorge Kennan) তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পশ্চিমী জগৎ এমন একটি পরিবেশের সন্ধান পেয়েছিল যা তার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত।

মনে রাখা দরকার যে কেন্নানের মতো একজন তথ্যনিষ্ঠ আমেরিকান লেখক এমন একটা সময়ে এই মূল্যায়ন করেছেন যখন আমেরিকা বিশ্বের অবিসংবাদিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত। তবুও ইউরোপে রাশিয়ার উপস্থিতি আমেরিকার মধ্যে একধরণের বিচ্ছিন্নতা ও কোণঠাসা হবার বোধ তৈরি করছিল। রাশিয়া আণবিক অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে আমেরিকার মনে এই ভীতির সৃষ্টি করেছিল যে সে আমেরিকায় আণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। ইউরোপে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি সোভিয়েত সৈন্যদের সদা প্রস্তুত রেখেছিল এবং তার ইউরোপের মিত্রদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছিল।

রাশিয়া তার ইউরোপের মিত্রদের নিয়ে একটি সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছিল, যার স্থায়ীত্ব নির্ধারণ করতে প্রথমে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিসমূহ এবং পরে তা আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল ওয়ারশ চুক্তি নামে। নিজের অংশের জার্মানির ওপর রাশিয়া তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল, জার্মানিতে যাতে আর কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে না পারে তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা নিয়েছিল রাশিয়া। আমেরিকার উপস্থিতি সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্টদের বিশেষত ফ্রান্স ও ইটালির কম্যুনিস্ট দলকে সমর্থন করত রাশিয়া, এছাড়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের শত্রু বলে যেসব দেশকে চিহ্নিত করেছিলেন লেনিন ও স্তালিন তাদের সাথেও রাশিয়া সামরিক বন্ধুত্ব রেখে চলছিল।

কম্যুনিস্টদের প্রতি সমর্থন-নীতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দুটি পুঁজিবাদী দেশকে সন্ত্রস্ত করেছিল। তারা রাশিয়াকে জার্মানির থেকেও বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করতে লাগল। তবে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি রাশিয়াকে লাভবান করেছিল, স্তালিন সুকৌশলে একের বিরুদ্ধে অন্যকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেন। যেহেতু পশ্চিম ইউরোপের কোনো অবিভাজ্য অস্তিত্ব ছিল না, সেহেতু অনেক পশ্চিমী শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও সহায়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইত। এমনকি যখন ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে তখনও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সুম্পর্ক নষ্ট হয়নি। বস্তুত পক্ষে পশ্চিমী গোষ্ঠী কখনোই মধ্য ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি।

এভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত প্রভাবাধীন একটি ইউরোপীয় এলাকা গড়ে উঠেছিল, যার পশ্চিম ইউরোপীয় বিকাশধারার বাইরে অবস্থিতি ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া স্পষ্টত একটি বিকল্প সামাজিক সংগঠন ও বিকাশের মডেল উপস্থাপিত করেছিল, যা আমেরিকাকে বিচলিত করেছিল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি অতিশক্তির উদ্ভবের ধারণার জন্ম হয়েছিল। শীঘ্রই বোঝা গিয়েছিল যে পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশের অতিশক্তি হবার মতো দায়বদ্ধতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি রয়েছে। রাশিয়া যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমেরিকার মতে আর্থ-সামাজিক বিকাশ তার হয়নি তবুও সে-ই আমেরিকার সমতুল্য শক্তির মর্যাদা লাভ করেছিল।